# ‘পুষ্টি ক্লিনিক’: পুষ্টি বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অনন্য উপাদান

নাসরীন জাহান লিপি

এবছরের ৪ জুন তারিখে আমেরিকার জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, আধুনিক চিকিৎসা শিক্ষায় পুষ্টি সম্বন্ধে বেশি কিছু শেখানো হচ্ছে না। শরীরের উচ্চতা আর বয়স অনুযায়ী বডি মাস ইনডেক্স বা বিএমআই দেখে, ওজন মেপে স্বাস্থ্যের অবস্থা আন্দাজ করে চিকিৎসকরা রোগীদের গড়পড়তাভাবে ওজন কমানোর পরামর্শ দিচ্ছেন। এর ফলে মানুষের মাঝে মোটা হয়ে যাওয়া এড়াতে না খেয়ে থাকার প্রবণতা বাড়ার সাথে সাথে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস তৈরির প্রবণতা কমছে। সুস্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টি অন্যতম প্রধান উপকরণ হলেও রোগীকে ওষুধের পাশাপাশি পুষ্টিভিত্তিক চিকিৎসা পরামর্শ প্রদানের চেষ্টা কম চিকিৎসকদের। নিবন্ধের মূল লেখক প্রফেসর কেয়ার্নি গনসালাস আমেরিকান চিকিৎসকদের বিষয়ে এরকম সমাধানে পৌঁছালেও বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবার দিকে মনোযোগ দিলে ভিন্ন কিছু কি চোখে পড়বে? আমরা ওজন কমানোর ফ্যাশনের পেছনে ছুটতে ইউটিউব ভিডিওর সাহায্য নেই। চিকিৎসকের কাছে ওষুধের সন্ধানে গেলেও পুষ্টিসংক্রান্ত পরামর্শ পাই না এবং এজন্য কোনো পুষ্টি বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া দরকার কি না বুঝতে পারি না। না খেয়ে থাকাকে স্বাস্থ্য সচেতন অভ্যেস হিসেবে মনে করা হয় এখনো। আবার পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বুঝতে পারলেও বিদ্যমান পুষ্টি বৈষম্যের কারণে অনেক পরিবারেই কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। পুষ্টি বৈষম্যের শিকার হচ্ছে কম উপার্জনক্ষম পরিবারসহ মোটা দাগে যে কোনো পরিবারের কন্যাশিশু, মা, নারী এবং বয়স্ক সদস্যরা।

বাংলাদেশে পুষ্টি বৈষম্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক এবং স্বাস্থ্যগত সমস্যা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটছে, তবুও অনেক মানুষের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। আর্থিক অক্ষমতার ফলে অনেক পরিবার মূল্যস্ফিতিতে প্রতিনিয়ত খাদ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে সঠিক পুষ্টি গ্রহণ করতে পারছে না। পুষ্টি সম্পর্কিত শিক্ষা না ও পাওয়ায় সচেতনতার অভাবে অনেকেই স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না। আবার যারা শিক্ষিত, তাদের মধ্যে পুষ্টিহীনতার সমস্যা কম। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় এই সমস্যা বেশি। ভৌগোলিক বৈষম্যের কারণেও শহরের তুলনায় গ্রামের মানুষের পুষ্টির অবস্থা অনেক খারাপ। এতে স্থানীয় কৃষির উৎপাদন এবং খাদ্যের প্রাপ্যতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আর গ্রাম-শহর নির্বিশেষে নারীর অবস্থা তো চিরকালই প্রান্তিক অবস্থানে। নারীরা সাধারণত পরিবারে পুষ্টি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকেন। এ কারণে তারা ও তাদের সন্তানরা প্রয়োজনীয় পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হন। বাংলাদেশের নারীদের মধ্যে রক্তাল্পতার হার খুব উচ্চ। শিশুদের মধ্যে পুষ্টিহীনতার হার উদ্বেগজনক। ইউনিসেফ এর তথ্য মতে, ২০২১ সালে বাংলাদেশের শতকরা ৩৩ ভাগ শিশু উচ্চমাত্রার পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। গরিব পরিবারের শিশুদের মধ্যে পুষ্টিহীনতার হার প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ। এটি তাদের স্বাস্থ্যে এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২০ সালে শতকরা ৩২ ভাগ শিশু পাঁচ বছরে যতটুকু উচ্চতা লাভ করা উচিত, তা করতে পারছে না। ১০০ জন শিশুর মাঝে ১৫ জনই কম ওজনের সমস্যায় ভুগছে। আর গরিব-ধনী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব পরিবারে কন্যাশিশুর ক্ষেত্রে পুষ্টি বৈষম্য বেশি এবং এটি অনেক কারণে ঘটে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কন্যাশিশুর প্রতি সামাজিক বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী। কন্যাশিশুর জন্য কম পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়াকে স্বাভাবিক মনে করা হয়, যা তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অনেক অভিভাবকই জানেন না কন্যাশিশুকে কীভাবে সঠিক পুষ্টি দিতে হবে, কেনো দিতে হবে।

পুষ্টি বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সমন্বিত উদ্যোগ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। পুষ্টিসংক্রান্ত ক্যাম্পেইন ও কর্মশালার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করতে হবে, গর্ভবতী নারীদের পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা এবং নারীর শিক্ষা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির উন্নয়ন করা জরুরি। স্কুলে পুষ্টি শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মাঝে পুষ্টির গুরুত্ব তুলে ধরে সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। দরিদ্র পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তা এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। কৃষকদের হাতে কলমে উচ্চফলনশীল খাদ্যশস্য চাষে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান ও পরামর্শ প্রদান করে জনগণকে খাদ্য নিরাপত্তা প্রদানে বিসিএস কৃষি ক্যাডার দুর্দান্ত ভূমিকা রাখছেন। তবে পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য খাদ্য নিরাপত্তার সাথে সাথে পুষ্টির অধিকার রক্ষা করতে দরকার পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা, গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করে সরকারের পুষ্টিবিষয়ক নীতি নির্ধারণ করা জরুরি। জরুরি সামাজিক নীতিমালার, এর সাথে দরকার যথাযথ আইনের প্রয়োগ।

পুষ্টি সংক্রান্ত পরামর্শ পেতে কোথায় যাবে মানুষ? গ্রামীন এবং সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি সংক্রান্ত সেবা পাওয়া কঠিন। স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি বৈষম্য দূরীকরণে সরকারি-বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার বহুমুখী অংশীদারীত্বের মাধ্যমে গ্রামীন এলাকায় পুষ্টি ক্লিনিক স্থাপন করা দরকার, যেখানে সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে পুষ্টি পরামর্শ ও চিকিৎসা দেওয়া হবে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়াসহ অনেক দেশে পুষ্টিবিদ এবং ডায়েটিশিয়ানদের দ্বারা পরিচালিত এরকম পুষ্টি ক্লিনিক আছে। সেবাপ্রার্থী ব্যক্তির জন্য যথাযথ পুষ্টি পরিকল্পনা তৈরি, পুষ্টিকরখাদ্য ও রোগ প্রতিরোধের জন্য বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দেওয়া হয় সেখানে। বাংলাদেশের শহর অঞ্চলে পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা চেম্বারে সেবা দিচ্ছেন, যা দরিদ্রদের জন্য সহজলোভ্য নয়। সাধারণ নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য বিনা মূল্যে সেবা দিতে সক্ষম ‘পুষ্টি ক্লিনিক’ গড়ে তোলা মোটেও কঠিন কাজ নয়।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে পুষ্টি ক্যাডার বলে কোনো ক্যাডার নেই। সিভিল সার্ভিসে ‘পুষ্টি ক্যাডার’ যোগ করার মাধ্যমে পুষ্টি বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে পারেন। পুষ্টি ক্যাডারের কর্মকর্তারা ‘পুষ্টি ক্লিনিক’ গড়ে তুলতে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারবেন, বিসিএস কৃষি ও বিসিএস খাদ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাথে পুষ্টি ক্যাডারের পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের সমন্বিত প্রচেষ্টাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে পুষ্টি বৈষম্য দূর করা সম্ভব।

বিদ্যমান প্রশাসনিক কাঠামোতে পুষ্টি বৈষম্য দূরীকরণের বিশাল ও বিস্তৃত কাজটি সম্ভব কী না ভেবে দেখা দরকার। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে মাঠ পর্যায়ে কাজ করে কৃষক ও কৃষির সমস্যা অনুধাবন ও সমাধানে সচেষ্ট দক্ষ কৃষি কর্মকর্তা যেমন দরকার, তেমনি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আসা উচিত খাদ্য নিরাপত্তা সম্বন্ধে শিক্ষা অর্জন করা, বিশেষ প্রশিক্ষণ লাভ করা ও দীর্ঘকাল এই সেক্টরে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করা কর্মকর্তার। বাস্তবে এর কোনোটাই কখনো হয়নি। ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশ সংস্কারের যে দুর্দান্ত সুযোগ এসেছে, সে সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পুষ্টি বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ নানা পদে কৃষি ও খাদ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়ন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। আর সত্যিই যদি ‘পুষ্টি ক্যাডার’ যাত্রা শুরু করতে পারে, তবে এই ক্যাডারের কর্মকর্তাদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি ও সম্ভাবনাকে বিস্তৃত করার সঠিক পরিকল্পনাও একইভাবে করা দরকার। কেননা, একুশ শতকের বাংলাদেশ বৈষম্যমুক্ত না হলে কোনোভাবেই বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না। আর সংস্কারের সুযোগ পাওয়া বাংলাদেশ পুষ্টি বৈষম্যকে বজায় রাখতে চাইবে না বলেই আমরা আশাবাদী হয়ে উঠছি।

#

লেখিকা: উপ প্রধান তথ্য অফিসার তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার